উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জ্যোতি প্রকাশন ।। ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

মহালয়া—১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ছবি ও অঙ্গসজ্জা
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

উপহার

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলার কিশোর ও শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম। শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের যুগ পরিবর্তনেও উপেন্দ্রকিশোর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অগণিত গল্প থেকে কয়েকটি সুন্দর ও চমকপ্রদ গল্প এতে সংকলিত করা হল। গল্পগুলি বাংলার শিশু ও কিশোর মনকে আকৃষ্ট করবে বলে আমরা মনে করি। শিশু-সাহিত্যের যাদুকর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এই গল্পগুলি একত্রে চয়ণ করে সম্পাদনা করেছেন শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক সুজিতকুমার নাগ।

—শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

জন্তুওয়ালা অনেক জন্তু লইয়া শহরে একটি ঘর ভাড়া করিয়াছে! মনে করিয়াছে, আজ হাটের দিন বিস্তর লোক হাটে আসিবে, আর তামাশা দেখিয়া পয়সা দিবে। হাটে লোকের কম নাই, কিন্তু জন্তুওয়ালার ঘরের আধখানাও ভরিল না। জন্তু-গুলায়ও যেন ফুর্তি নাই। লোক কম দেখিয়া তাহারাও কেমন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। ভালো তামাশা হইতেছে না দেখিয়া, যে দু-চার জন দর্শক উপস্থিত, তাহারাও হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

এমন সময় বাঘটার যেন কী হইল। সে এতক্ষণ খাঁচার এক কোণে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। কথা নাই, বার্তা নাই হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, খাঁচার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ানক গর্জন! সেই গর্জন শুনিয়া দর্শকেরা হাসি-ঠাট্টা ফেলিয়া, দুই লাফে দূরে সরিয়া গেল।

ব্যাপারখানা কী? এত রাগের তো কোনো কারণই দেখা

যায় না—তবে ঐ যে গাঁট্টাগোট্টা, লাল-গোঁফওয়ালা জাহাজের মাল্লাটা, নীল কোট পরিয়া থেঁতলো টুপি মাথায় দিয়া, এইমাত্র তামাশা দেখিবার জন্য ঘরের ভিতরে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া যদি বাঘমহাশয়ের ক্রোধ হইয়া থাকে।

মাল্লা বাঘের খাঁচার দিকে চাহিল, বাঘটাকেও খানিকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ করিয়া দেখিল, তারপর অমনি একেবারে বাঘের কাছে গিয়া উপস্থিত! বাঘ তাহাকে কাছে পাইয়া আরও গর্জন করিয়া উঠিল। দর্শকেরা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, আর
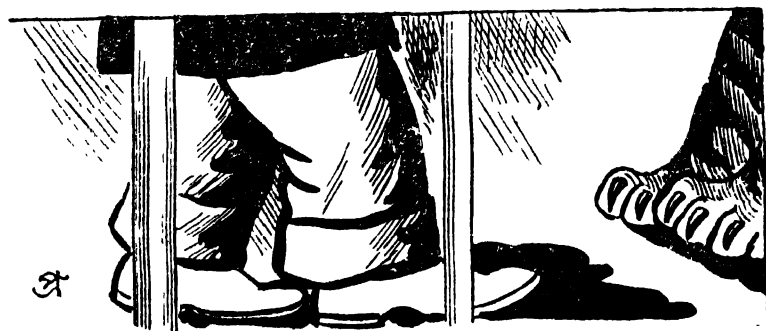
তাহাদের বড় ভয়ও হইল। মাল্লা কিন্তু ততক্ষণে খাঁচার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিয়া, দিব্যি বাঘের মাথা চাপড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—সেটাকে যেন সে বিড়ালছানা পাইয়াছে। মাল্লা বলিল,—'কী রে বিল্লি, কেমন আছিস ভাই ?' লোকগুলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যে ভয়ঙ্কর দাঁত, এক কামড়েই তো মাল্লার হাতখানাকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

বাঘ কিন্তু তেমন কিছুই করিল না। সে তাহার প্রকাণ্ড মাথাটা আনিয়া, আদর করিয়া জ্যাকের (মোল্লার নাম) হাতে

ঘষিতে লাগিল, আর আদর পাইলে বিড়ালের গলায় যেমন গুড়গুড় শব্দ হয়, তেমনি শব্দ করিতে লাগিল।

মুহূর্তের মধ্যে বাইরের লোকে ইহার খবর পাইয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিতে লাগিল, ঘরে আর লোক ধরে না। কত লোক দরজায় এক পয়সায় জায়গায় সিকি দুআনি ফেলিয়া দিয়া আর বাকি পয়সায় জন্য দাঁড়ায় নাই, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে পারিলেই ঢের মনে করিয়াছে। জন্তুওয়ালার এখন আর দুঃখ করিবার কোনো কারণ নাই। তাহার বাক্স বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

মাল্লা ততক্ষণে জন্তুদের একজন প্রহরীর হাত ধরিয়া বলিল, 'বিল্লির খাঁচাটা একবার খোলো না ভাই। ও আমার পুরনো বন্ধু ঃ একবার ভেতরে গিয়ে ওর সঙ্গে পুরনো কালের দুটো গল্প করে নিই।

প্রহরী বেচারা একটু মুশকিলে পড়িল, আর তা হওয়ারই কথা। বিশ্বাস কী? চোখের সামনে একটা লোককে চিবাইয়া খাইবে, এরূপ দেখিতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। আর খাঁচা খুলিলে জ্যাক ঘরে যাইবেন, অথচ বাঘ বাহিরে আসিবেন না, এরূপ করাও তো সহজ ব্যাপার নয়। বাঘ যদি একবার বাহিরে আসিয়া হাই তোলেন, তবে তামাশাটা কী রকমের হইবে! প্রহরী আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি সত্যি বলছ নাকি?' জ্যাক একটু চটিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি না তো কী? এ কোথাকার বোকা? দেখতে পাচ্ছ না, ও আমাকে চিনতে পেরেছে?

বাঘ সেই সময় আর হাঁক দিয়াছে, যেন বলিতেছে—'হ্যাঁ হে হ্যাঁ।'

প্রহরী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া এক হাতে দরজা খুলিল, আর এক হাতে একখানা লোহার রুল বাগাইয়া ধরিল। জন্তুগুলি কথা না শুনিলে ঐ রুল দিয়া সে তাহাদের শাসন করে।

সে দরজা খুলিল, অমনি দর্শকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইল—পাছে বাঘ মহাশয়ের হঠাৎ জলযোগের খেয়াল হয়, আর বাহিরে আসিয়া দু-একটিকে ধরিয়া মুখে দেন। কিন্তু বিল্লি তাহার বন্ধুকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, অন্য লোকের কোনো খবর নেয় নাই।

বাঘ অনেকবার মাল্লার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার গায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল; তাহার পর দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, হাত দুখানি জ্যাকের কাঁধে তুলিয়া দিল। জ্যাকও তাহার টুপিটা লইয়া বাঘের মাথায় পরাইয়া দিল।

টুপি পরিয়া বাঘকে নেহাত মন্দ দেখিতে হইল না—দর্শকেরা খুবই হাসিয়াছিল। কিন্তু তার পর আরও মজা হইয়াছিল।

টুপিটা ফিরাইয়া লইয়া মাল্লা বলিল, 'বিল্লি, যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে তো? দেখি—লাফা।' মাল্লা হাত খুব বাড়াইয়া ধরিল, আর বাঘ তাহার ঐ প্রকাণ্ড শরীরটা লইয়া পরিষ্কার তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গেল।

আচ্ছা, ফিরে এসো।' বাঘ অমনি আবার লাফাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভারি বাধ্য ছাত্র।

প্রহরী ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল, সে কত চেষ্টা করিয়াও সেই বাঘকে দিয়া এত কাজ করাইতে পারে নাই। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই এত কথা ওকে কী করে শেখালে?

জ্যাক হাসিয়া বলিল, 'জাহাজে থাকতে ওকে খাওয়ানোর ভারটা আমার হাতেই ছিল। সেটা দেখছি আজও সে ভোলেনি

—কেমন রে বিল্লি? বাঘ একটু ঘোঁৎ করিল, যেন বলিল 'আ রে না,!'

মাল্লা বলিল, 'আচ্ছা বিল্লি, বোসো তো'—অমনি বাঘ মাটিতে বিড়ালের মতন করিয়া বসিয়া পড়িল। মাল্লা তাহার গায়ে ঠেসান দিয়া বসিয়া এক হাতে তাহার থাবা চুলকাইয়া দিতে লাগিল। তার পর গান ধরিল।

বাঘ গানের সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ করিয়া খাঁচার মেজে চাপড়াইতে লাগিল। খাঁচাখানা কাঁপতে লাগল। মাল্লা যখন খুব জোরে গাইতে লাগিল, তখন বাঘ 'এঁয়াও' করিয়া তাহার সঙ্গে তখন তান ধরিল। সেই তানের চোটে ঘরের জানালাগুলি খটখট করিয়া উঠিল।

আরো তামাশা হইত কিন্তু জ্যাক এই সময়ে জানালার ভিতর দিয়া গির্জার ঘড়ি দেখিতে পাইল। তাহাকে রেলে অনেক দূর যাইতে হইবে, আর দেরি করিলে চলিতেছে না। সুতরাং সে বিল্লির কাছে বিদায় লইল। বিল্লি কিন্তু তাহাকে অত তাড়াতাড়ি ছাড়িতে রাজী নহে। জ্যাকের সঙ্গে সঙ্গে সেও খাঁচার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—প্রহরী দরজা খুলিলে সেও জ্যাকের সঙ্গে যাইবে! প্রহরী দরজা খুলিতেছিল, বাঘের কাণ্ড দেখিয়া আর খুলিল না। জ্যাক তিনবার চুপচাপ সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল, বাঘ তাহার কোটের কোণ কামড়াইয়া ধরিয়া তিনবার ফিরাইল। জ্যাক মুশকিলে পড়িয়া বলিল, 'এ তো বড় মুশকিল রে বাবু! আমি তো থাকতে আসিনি, আমি যে শুধু দেখতে এসেছিলাম।'

কিন্তু প্রহরীর মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মাল্লা যতই যাইতে চাহিতেছে বাঘ ততই বিরক্ত হইতেছে; শেষে চটিয়া গিয়া এক থাপ্পড় বসাইয়া দিলেই তো মাল্লার দফা নিকাশ

হইয়া যায়! এই সময়ে এক বুদ্ধি জুটিল। খাঁচাটাতে দুই কামরা। বাহিরটাতে বাঘ সকল লোকের সামনে তামাশা দেখায় ভিতরটাতে বসিয়া সে আহার করে। মাঝখানে দরজা আছে, বাহির হইতেই তাহা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এই ভিতরের কামরায় বড় এক টুকরা মাংস ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, আর বাঘ অমনি বন্ধুকে ভুলিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। চতুর প্রহরী তৎক্ষণাৎ মাঝখানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জ্যাকও সুযোগ বুঝিয়া তাহার পথ ধরিল।
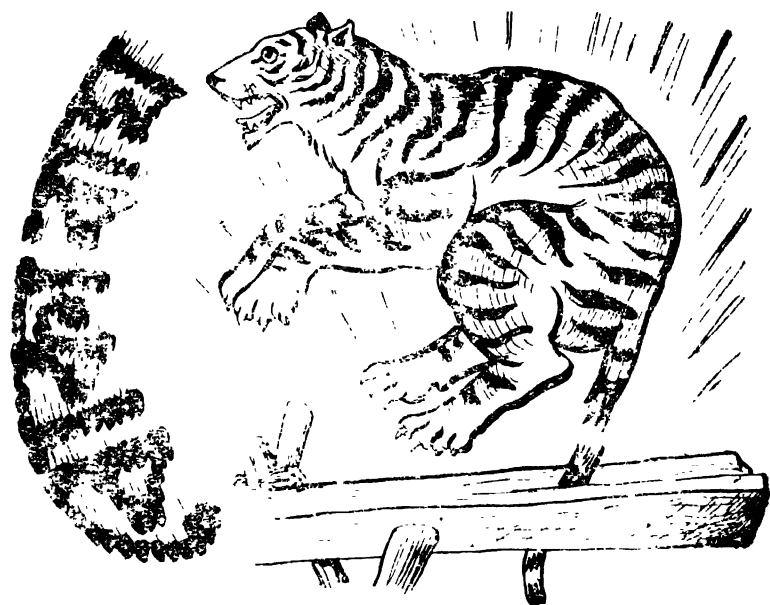
এক রাজার বাড়ির কাছে এক শিয়াল থাকত। রাজার ছাগলের ঘরের পিছনে তার গর্ত ছিল।

রাজার ছাগলগুলি খুব সুন্দর আর মোটা মোটা ছিল।

তাদের দেখলেই শিয়ালের ভারি খেতে ইচ্ছে হত। কিন্তু রাজার রাখালগুলির ভয়ে তাদের কাছে আসতে পারত না।

তখন শিয়াল তার গর্তের ভিতর থেকে খুড়তে আরম্ভ করল। খুড়ে-খুড়ে তো সে ছাগলের ঘরে এসে উপস্থিত হল, কিন্তু তবুও ছাগল খেতে পেল না।

রাখালের দল তখন সেখানে বসেছিল। তারা শিয়ালকে দেখতে পেয়েই ধরে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে খোঁটায় বেঁধে রেখে তারা চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'কাল এটাকে

নিয়ে সকলকে তামাসা দেখাব, তারপর মারব। আজ রাত হয়ে গেছে।'

রাখালেরা চলে গেছে, শিয়াল মাথা হেঁট করে বসে আছে, এমন সময় এক বাঘ সেইখান দিয়ে যাচ্ছে।

শিয়ালকে দেখে বাঘ ভারি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কি ভাগ্নে, এখানে কি করছ?'

শিয়াল বললে, 'বিয়ে করছি।'

বাঘ বললে, 'তবে কনে কোথায়? লোকজন কোথায়?

শিয়াল বললে, 'কনে তো রাজার মেয়ে! লোকজন তাকে আনতে গেছে।'

বাঘ বললে, 'তুমি বাঁধা কেন?'

শিয়াল বললে, 'আমি কিনা বিয়ে করতে চাইনি, তাই আমাকে বেঁধে রেখে গেছে পাছে আমি পালাই।'

বাঘ বললে, 'সত্যি নাকি! তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ না।'

শিয়াল বললে, 'সত্যি মামা! আমার বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না।

তা শুনে বাঘ ভারি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে তোমার জায়গায় আমাকে বেঁধে রেখে তুমি চলে যাও না!

শিয়াল বললে, 'এক্ষুনি! তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর আমি তোমাকে বেঁধে রেখে যাচ্ছি!'

তখন বাঘের আনন্দ দেখে কে! সে অমনি এসে শিয়ালের বাঁধন খুলে দিল। শিয়ালও আর দেরি না করে, তাকে ভালো মতো খোঁটায় বেঁধে বললে, 'এক কথা মামা। তোমার শালারা এসে তোমার সঙ্গে হাসি-তামাসা করবে। তাতে বা তুমি চটো?'

বাঘ বললে, 'আরে না! আমি কি তাতে চটি? আমি বুঝি এতই বোকা!' এ কথায় শিয়াল হাসতে হাসতে চলে গেল। বাঘ ভাবতে লাগল, কখন কনে নিয়ে আসবে।

সকালবেলায় রাখালের দল উপস্থিত হল। বাঘ তাদের দেখে ভাবল, 'এই আমার শালারা এসেছে! এখুনি হয়তো ঠাট্টা করবে। আর তাহলে আমাকে খুব হাসতে হবে।'

রাখালেরা এসেছিল শিয়াল মারতে। এসে দেখলে বাঘ বসে আছে। অমনি তো ভারি একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ পালাতে চায়, কেউ-কেউ তাদের থামিয়ে বললে, 'আরে বাঁধা রয়েছে দেখছিস না? ভয় কি? কুড়ল, খন্তা, বল্লম নিয়ে আয়।'

তখন একজন একটা মস্ত ইট এনে বাঘের গায়ে ছুড়ে মারলে।

তাতে বাঘ বললে, 'হাঃ, হাঃ, হাহা হাহা।'

আর একজন একটা বাঁশ দিয়ে গুঁতো মারলে।

তাতে বাঘ বললে, 'হীঃ, হীঃ, হিহি, হিহি!'

আর একজন একটা বল্লম দিয়ে খোঁচা মারলে।

তাতে বাঘ বললে, 'উঃ হূঃ হূঃ! হোহো হোহো হোহো! —বুঝেছি তোমরা আমার শালা!'

আবার তারা বল্লমের খোঁচা মারলে।

তাতে বাঘ বেজায় রেগে বললে, 'দুত্তোর! এমন ছাই বিয়ে আমি করব না!' বলে সে দড়ি ছিঁড়ে বনে চলে গেল।

বনের ভিতরে এক-জায়গায় করাতীরা করাত দিয়ে কাঠ চিরত। একটা মস্ত কাঠ আধখানা চিরে রেখে, সেইখানে গোঁজ মেরে করাতীরা চলে গিয়েছে। এই সময় বাঘ বনের ভিতর

এসে দেখে, শিয়াল সেই আধচেরা কাঠখানার উপর বসে বিশ্রাম করছে।

শিয়াল তাকে দেখেই বললে, 'কি মামা, বিয়ে কেমন হল?'

বাঘ বললে, 'না ভাগ্নে, ওরা বড্ড বেশি ঠাট্টা করে! তাই আমি চলে এসেছি।'

শিয়াল বললে, 'তা বেশ করেছ! এখন এস, দুজনে বসে গল্প স্বল্প করি।'

বলতেই বাঘ লাফিয়ে কাঠের উপরে উঠেছে, আর বসেছে ঠিক যেখানটায় কাঠটা খুব হাঁ করে আছে, সেইখানে। তার লেজটা সেই ফাঁকের ভিতর ঢুকে ঝুলে রয়েছে।

শিয়াল দেখলে যে এবারে কাঠ থেকে গোঁজটি খুলে নিলেই বেশ তামাসা হবে। সে বাঘকে নানান কথায় ভোলাচ্ছে আর একটু একটু করে গোঁজাটিকে নাড়ছে। নাড়তে-নাড়তে এমন রকরেছে যে, এখন টানলেই সেটা খুলে যাবে, আর কাঠ বাঘে লেজ কামড়ে ধরবে। তখন সে 'মামা, গেলুম।' বলে সেই গোঁজসুদ্ধ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

আর বাঘের যে কি হল সে আর বলে কি হবে? কাঠ লেজে কামড়ে ধরতেই তো সে বেজায় চেঁচিয়ে এক লাফ দিল। সেই লাফে ফটাং করে লেজ ছিঁড়ে একেবারে দুইখান! তখন বাঘও শিয়ালের সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বাঘ বললে, 'ভাগ্নে, গেলুম! আমার লেজ ছিঁড়ে গিয়েছে!'

শিয়াল বললে, 'মামা, গেলুম! আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে।'

এমনি করে দুজনে গড়াগড়ি দিয়ে, এক কচুবনে ঢুকে শুয়ে রইল। বাঘ আর নড়তে-চড়তে পারে না। কিন্তু শিয়াল বেটার

কিছু হয়নি, সে আগাগোড়াই বাঘকে ফাঁকি দিচ্ছে।

সেই কচুবনের ভিতর ঢের ব্যাঙ ছিল, শিয়াল শুয়ে শুয়ে তাই ধরে পেট ভরে খেল। বাঘ বেদনায় অস্থির, সে ব্যাঙ দেখতেই পেল না—খাবে কি ? কিন্তু তার এমনি খিদে পেয়েছে যে, কিছু না খেলে সে মরেই যাবে ? তখন সে শিয়ালকে জিগগেস করলে, 'ভাগ্নে, তুমি কিছু খেয়েছ নাকি ?'

শিয়াল বললে, 'আর কি খাব ? এই কচুই খেয়েছি। খেয়ে আমার পেট বড্ড ফেঁপেছে।'

বাঘও আর কি করে। সে কচুই চিবিয়ে খেতে লাগল। তারপর গলা ফুলে, মুখ ফুলে, সে যায় আর কি !

তা দেখে শিয়াল বললে, 'কি মামা, কিছু খেলে ?'

বাঘ বললে, 'খেয়েছি তো ভাগ্নে, কিন্তু বড্ড গলা ফুলেছে। তোমার তো পেট ফেঁপেছে. আমার কেন গলা ফুলল ?'

শিয়াল বললে, 'আমি কিনা শিয়াল, আর তুমি কিনা বাঘ, তাই।'

লেজের ব্যথায় আর গলার ব্যথায় বাঘ ষোলোদিন উঠতে পারলে না। এই ষোলোদিন কিছু না খেয়ে সে আধমরা হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় সে দেখলে শিয়াল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দিব্যি চলে যাচ্ছে। তাতে সে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলে, কি ভাগ্নে, তোমার অসুখ কি করে সারল ?'

শিয়াল বললে, 'মামা, একটা ভারি চমৎকার ওযুধ পেয়েছি ? আমি আমার হাত-পা চিবিয়ে খেলুম, আর তক্ষুনি আমার অসুখ সেরে গেল। তারপর দেখতে-দেখতে নতুন হাত-পা হল।'

বাঘ বললে, 'তাই নাকি ? তবে আমাকে বলনি কেন ?'

শিয়াল বললে, 'তুমি কি আর তোমার হাত পা চিবিয়ে খেতে পারবে? তাই বলিনি।'

এ কথায় বাঘ ভীষণ রেগে বললে, 'তুই শিয়াল হয়ে পারলি, আর আমি বাঘ হয়ে পারব না?'

শিয়াল বললে, 'তুমি দুটো ঠাট্টার ভয়ে অমন বিয়েটা ছেড়ে এলে! এখন যে হাত-পা চিবিয়ে খেতে পারবে তা আমি কি করে জানব?' তখন বাঘ বললে, 'পারি কি না, এই দেখ!' বলে সে নিজের হাত-পা চিবিয়ে খেল। তারপর তিন-চার দিনের মধ্যেই ভয়ানক ঘা হয়ে সে মারা গেল।
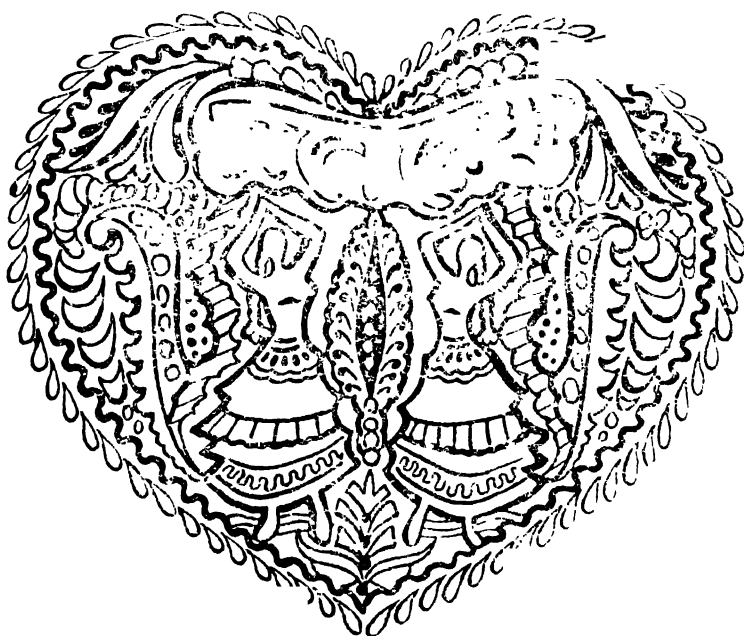
এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন, আর একটি ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের খেতে দেবার জন্য কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন, এক বেলায় ভালো করে না খেতেই তা ফুরিয়ে যেত। সকল দিন আবার তাও মিলত না।

একদিন তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল, সে বাড়িতে পায়েস রান্না হয়েছে, ছেলেরা পায়েস খাচ্ছে। দেখে সেই মেয়েটির বড্ড পায়েস খেতে ইচ্ছে হল। তাই সে বাড়ি এসে তার মাকে বললে, 'মা', আমাকে পায়েস করে দাও না, আমি পায়েস খাব।'

শুনে তার মা কাঁদতে লাগলেন। ভাতই ভালো করে খেতে পান না, পায়েশ আবার কি করে করবেন ?

এমন সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষে নিয়ে ফিরে এসে ব্রাহ্মণী কাঁদছেন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন ব্রাহ্মণী, কি হয়েছে।

ব্রাহ্মণী বললেন, 'মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, পায়েস কাথেকে দেব, তাই আমি কাঁদছি।'

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখছি এর একটা কিছু করতে পারি কিনা, তুমি কেঁদ না।' বলে তিনি তখুনি আবার বেরিয়ে গেলেন।

সেই গ্রামে একজন খুব ভালো জমিদার ছিলেন। তিনি যেই শুনলেন,ব্রাহ্মণের মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে অমনি তাঁকে চমৎ-কার গোপালভোগ চাল, দু'সের দুধ, চিনি আর মশলা দিলেন।

ব্রাহ্মণ তাতে খুব খুশি হয়ে, জমিদারকে আশীর্বাদ করে ছুটে বাড়ি এসে ব্রাহ্মণীকে বললেন, 'এই নাও, তোমার পায়েসের যোগাড় এনেছি।'

সেই ব্রাহ্মণী কি লক্ষ্মী মেয়েই ছিলেন। তিনি এমন সুন্দর রাঁধতেন যে, তেমন রান্না কেউ কখনো খায়নি। তিনি যখন পায়েস রাঁধতে লাগলেন, তখন তার চমৎকার গন্ধে আশ পাশে সকল লোক পাগল হয়ে উঠল!

একটা কাক সেই পায়েসের গন্ধ পেয়ে বললে, 'আহা। এমন চমৎকার জিনিস একটু না খেয়ে দেখলে চলছে না।'

বলেই সে ব্রাহ্মণের ঘরের চালে এসে বসল।

কাক অনেকক্ষণ ধরে ঘরের চালে চুপ করে বসে রইল। তারপর রান্নাঘরে একটু শব্দ হতেই সে বললে ঐ। এবারে রান্না হয়েছে।

খানিক বাদে আর একটু শব্দ হল, আর অমনি কাক বললে, 'ঐ। এবারে বাড়ছে।'

খানিক বাদে আর একটু হল, অমনি কাক বললে, 'ঐ! এবারে যাচ্ছে!'

সত্যি-সত্যি ব্রাহ্মণ আর তাঁর মেয়ে তখন খেতে বসেছিলেন সে পায়েস এতই ভালো হয়েছিল যে, তাঁরা দুজনেই তা প্রায় শেষ করে ফেললেন। ব্রাহ্মণীর জন্যে খুব কমই রইল। তারপর ব্রাহ্মণীর খাওয়া যখন শেষ হল, তখন পাতে বা হাঁড়িতে পায়েসের দাগ অবধি রইল না।

কাক এতক্ষণ বসে থেকেও যখন কিছু খেতে পেল না, তখন তার বড্ড রাগ হল। সে মনে-মনে বললে 'আমাকে এমন করে ঠকালে! এর শোধ দিতেই হবে।'

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাছেই একটা প্রকাণ্ড বন ছিল, সেই বনে মস্ত একটা বাঘ থাকত।

কাক দুষ্টু ফন্দি এঁটে সেই বাঘকে গিয়ে বললে, 'বাঘমশাই, আমাদের ব্রাহ্মণঠাকুরের একটি খুব সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি এমন সুন্দর বর, আপনার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে হলে ভালো হয়।'

বাঘ বললে, 'বিয়ে ঠিক করে দেবে কে? আমি কথা কইতে গেলে তো তারা ছুটে পালাবে!'

কাক বললে, 'আপনার কিছু করতে হবে না, আমি সব করে দিচ্ছি। আগে আপনি ব্রাহ্মণকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।'

বাঘ বললে, 'বেশ কথা! আমি গ্রামে গিয়ে কুত্তা মেরে বামুনের বাড়ি রেখে আসব।'

কাক তা শুনে জিভ কেটে বললে, 'না-না! তারা কুত্তা খাবে না! আপনার বাড়িতে যে লেবুর গাছ আছে, সেই গাছের লেবু পাঠিয়ে দিন। আমি লেবু নিয়ে যাব এখন।

বলে সে কয়েকটা লেবু নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিয়ে এসে

বললে, 'বাঘমশাই, তারা তো লেবু খেয়ে ভারি খুশি হয়েছে। এমন করে দিন কতক লেবু দিলেই মেয়ে বিয়ে দেবে।'

শুনে বাঘ আহ্লাদে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এমনি করে কাক রোজ লেবু নিয়ে যায় আর বাঘকে এসে বলে 'তারা মেয়ে দেবে।' আসলে সেটা মিথ্যে কথা, কিন্তু বাঘ মনে করে, ব্রাহ্মণ বুঝি সত্যি-সত্যি মেয়ে দেবে বলেছে।

তারপর একদিন বাঘ বললে, 'কই, লেবু তো ফুরিয়ে গেল, মেয়ে তো বিয়ে দিলে না!'

কাক বললে, 'দেবে বইকি!' আপনি যখন চাইবেন, তক্ষুনি দেবে।'

বাঘ বললে, 'তবে তাদের বল গিয়ে যে, যদি কাল রাত্রে মেয়ে বিয়ে না দেয়, তা হলে তাদের সবাইকে চিবিয়ে খাব।'

কাক তো তাই চায়। সে তক্ষুনি ব্রাহ্মণের বাড়ি গিয়ে বললে, ওগো, শুনছ? কাল রাত্রে বাঘ আসবে, তোমাদের মেয়ে বিয়ে করতে। যদি বিয়ে না দাও, চিবিয়ে খাবে।'

একথা শুনেই তো ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীকে চাপড়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কান্না শুনে গ্রামের লোক ছুটে এসে বললে, 'কি হয়েছে?'

ব্রাহ্মণ কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'কাল বাঘ আসবে, আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে। বিয়ে না-দিলে সকলকে চিবিয়ে খাবে।'

শুনে গ্রামের লোক বললে, 'এই কথা! আচ্ছা, দেখা যাবে বেটা কেমন বিয়ে করে, আর না দিলে চিবিয়ে খায়! আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলে তারা বাঘের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে, 'বাঘমশাই, এমন ভালো বর কি আর হবে! আপনি পোশাক পরে

আসবেন, সভার মাঝে বসবেন, গান-বাজনা শুনবেন, নিমন্ত্রণ খাবেন, তারপর বেশ ভালো মতো বিয়ে করে চলে যাবেন।'

তারপর তারা সকলে মিলে ব্রাহ্মণের উঠানে তিনশো উনুন কেটে তাতে তিনশো হাঁড়ি তেল চড়াল। কুয়োর উপরে চমৎকার বিছানা করে রাখল। তারপর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে খুব শোরগোল করতে লাগল।

বাঘ সেই গোলমাল শুনে বললে, 'ঐরে আমার বিয়ের ধুম লেগেছে।' তখন সে তাড়াতাড়ি জামা-যোড় পরে, পাগড়ি এঁটে, নাচতে-নাচতে এসে ব্রাহ্মণের বাড়ি উপস্থিত হল।

অমনি সকলে 'আরে, বর এসেছে। বাজা, বাজা!' বলে বাঘমশাইকে সেই কুয়োর উপরকার বিছানা দেখিয়ে দিলে। বাঘমশাই তো তাতে লাফিয়ে বসতে গিয়ে 'ঘেঁয়াও!' করে বিছানাসুদ্ধ কুয়োয় পড়েছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলে মিলে সেই তিনশো হাঁড়ির তেল, আর তিনশো উনুনের আগুন কুয়োয় এনে ঢেলেছে।

তারপর দেখতে-দেখতে বোকা বাঘ পুড়ে ছাই হল, ব্রাহ্মণের আপদ কেটে গেল।

কাক তামাসা দেখবার জন্যে ঘরের চালে বসে ছিল, পাড়ার ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিল।

এক গ্রামে দুটো বিড়াল ছিল। তার একটা থাকত গোয়ালাদের বাড়িতে, সে খেত দই, দুধ, ছানা, মাখন আর সর। আর একটা থাকত জেলেদের বাড়িতে, সে খেত খালি ঠেঙার বাড়ি আর লাথি। গোয়ালাদের বিড়ালটা খুব মোটা ছিল, আর সে বুক ফুলিয়ে চলত। জেলেদের বিড়ালটার গায় খালি চামড়া আর হাড় ক'খানি ছিল। সে চলতে গেলে টলত, আর ভাবত, কেমন করে গোয়ালাদের বিড়ালের মতো মোটা হব।

শেষে একদিন সে গোয়ালাদের বিড়ালকে বললে, 'ভাই, আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ।'

সব কিন্তু মিছে কথা। নিজেই খেতে পায় না, সে আবার নিমন্ত্রণ খাওয়াবে কোথা থেকে? সে ভেবেছে, 'গোয়ালাদের বিড়াল আমাদের বাড়ি এলেই আমার মতন ঠেঙা খাবে আর মরে যাবে, তারপর আমি গোয়ালাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব।'

যে কথা সেই কাজ। গোয়ালাদের বিড়াল জেলেদের বাড়িতে আসতেই জেলেরা বললে, 'ঐ রে! গোয়ালাদের সেই দই-দুধ-খেকো চোর বিড়ালটা এসেছে, আমাদের মাছ খেয়ে শেষ করবে। মার বেটাকে!'

বলে তারা তাকে এমনি ঠেঙালে যে, বেচারা তাতে মরেই গেল। রোগা বিড়াল তো জানতই যে, এমনি হবে। সে তার আগেই গোয়ালাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে! সেখানে খুব করে ক্ষীর সর খেয়ে, দেখতে-দেখতে সে মোটা হয়ে গেল। তখন আর সে অন্য বিড়ালের সঙ্গে কথা কয় না, আর নাম জিগগেস করলে বলে, 'মজন্তালী সরকার।'

একদিন মজন্তালী সরকার কাগজ কলম নিয়ে বেড়াতে-বেরুল। বেড়াতে-বেড়াতে সে বনের ভিতরে গিয়ে দেখল যে

তিনটি বাঘের ছানা খেলা করছে। সে তাদের তিন তাড়া লাগিয়ে বলল, 'এইয়ো! খাজনা দে!' বাঘের ছানাগুলো তার কাগজ কলম দেখে আর ধমক খেয়ে বড্ড ভয় পেল। তাই তারা তাড়াতাড়ি তাদের মায়ের কাছে গিয়ে বললে, 'ও মা, শিগগির এস! দেখ এটা কি এসেছে, আর কি বলছে!'

বাঘিনী তাদের কথা শুনে এসে বললে, 'তুমি কে বাছা? কোত্থেকে এলে? কি চাও?'

মজন্তালী বললে, 'আমি রাজার বাড়ির সরকার, আমার নাম মজন্তালী। তোরা যে আমাদের রাজার জায়গায় থাকিস, তার খাজনা কই? খাজনা দে!'

বাঘিনী বললে, 'খাজনা কাকে বলে তা তো আমি জানিনে! আমরা খালি বনে থাকি, আর কেউ এলে তাকে ধরে খাই।

তুমি না হয় একটু বস, বাঘ আসুক।'

তখন মজন্তালী একটা উঁচু গাছের তলায় বসে, চারিদিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। খানিক বাদেই সে দেখল—ঐ বাঘ আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি কাগজ কলম রেখে, একেবারে গাছের আগায় গিয়ে উঠল।

বাঘ আসতেই তো বাঘিনী তার কাছে সব কথা বলে দিয়েছে, আর বাঘের যে কি হয়েছে কি বলব। সে ভয়ানক গর্জন করে বললে, 'কোথায় সে হতভাগা? এখুনি তার ঘাড় ভাঙচি!'

মজন্তালী গাছের আগা থেকে বললে, 'কি রে বাঘা, খাজনা দিবি না? আয়, আয়!'

শুনেই তো বাঘ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, 'হাল্লুম!' বলে দুই লাফে সেই গাছে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু খালি উঠলে কি হয়? মজন্তালীকে ধরতে পারলে তো! সে একটুখানি হালকা জন্তু, সেই কোন সরু ডালে উঠে বসেছে, অত বড় ভারি বাঘ সেখানে যেতেই পারছে না। না পেরে রেগে মেগে বেটা দিয়েছে একলাফ, অমনি পা হড়কে গিয়েছে পড়ে! পড়তে গিয়ে, দুই ডালের মাঝখানে মাথা আটকে, তার ঘাড় ভেঙে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।

তা দেখে মজন্তালী ছুটে এসে তার নাকে তিন চারটে আঁচড় দিয়ে বাঘিনীকে ডেকে বললে, 'এই দেখ, কি করেছি। আমার সামনে বেয়াদবি!'

এ সব দেখে শুনে তো ভয়ে বাঘিনী বেচারীর প্রাণ উড়ে গেল? সে হাত জোড় করে বললে, 'দোহাই মজন্তালী মশাই, আমাদের প্রাণে মারবেন না! আমরা আপনার চাকর হয়ে থাকব।'

তাতে মজন্তালী বললে, ‘আচ্ছা, তবে থাক, ভালো করে কাজকর্ম করিস, আর আমাকে খুব ভালো খেতে দিস।’

সেই থেকে মজন্তালী বাঘিনীদের বাড়িতেই থাকে। খুব করে খায়, আর বাঘিনীর ছানাগুলির ঘাড়ে চড়ে বেড়ায়। সে বেচারারা তার ভয়ে একেবারে জড়-সড় হয়ে থাকে, আর তাকে মনে করে, না জানি কত বড় লোক!

একদিন বাঘিনী তাকে হাত জোড় করে বললে, ‘মজন্তালী মশাই, এ বনে খালি ছোট-ছোট জানোয়ার, এতে কিছু আপনার পেট ভরে না, নদীর ওপারে খুব ভারি বন আছে, তাতে খুব বড়-বড় জানোয়ারও থাকে। চলুন, সেইখানেই যাই।’

শুনে মজন্তালী বললে, ‘ঠিক কথা! চল ওপারে যাই।’ তখন বাঘিনী তার ছানাদের নিয়ে, দেখতে-দেখতে নদীর ওপারে চলে গেল। কিন্তু মজন্তালী কই? বাঘিনী আর তার ছানারা অনেক খুঁজে দেখল—ঐ মজন্তালী সরকার নদীর মাঝখানে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে! স্রোতে তাকে ভাসিয়ে সেই কোথায় নিয়ে গিয়েছে, আর ঢেউয়ের তাড়ায় তার প্রাণ যায়-যায় হয়েছে!

মজন্তালী তো ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, আর দুটো ঢেউ এলেই সে মারা যাবে! এমন সময় ভাগ্যিস বাঘিনীর একটা ছানা তাকে তাড়াতাড়ি ডাঙায় তুলে এনে বাঁচাল, নইলে সে মরেই যেত, তাতে আর ভুল কি?

কিন্তু মজন্তালী সরকার তাদের সে কথা জানতেই দিল না। সে ডাঙায় উঠেই ভয়ানক চোখ রাঙিয়ে বাঘের ছানাকে চড় মারতে গেল, আর গাল যে কত দিল তার তো লেখা-জোখাই নেই। শেষে বললে, ‘হতভাগা মূর্খ, দেখ দেখি কি করলি! আমি অমন চমৎকার হিসাবটা করছিলুম, সেটা শেষ না হতেই

তুই আমাকে টেনে তুলে আনলি—আর আমার সব হিসাব এলিয়ে গেল। আমি সবে গুনছিলুম, নদীতে কটা ঢেউ, কতগুলো মাছ আর কতখানি জল আছে। মূর্খ বেটা, তুই এর মধ্যে গিয়ে সব গোলমাল করে দিলি। এখন যদি আমি রাজামশাইয়ের কাছে গিয়ে এর হিসাব দিতে না পারি, তবে মজাটা টের পাবি।'

এসব কথা শুনে বাঘিনী তাড়াতাড়ি এসে হাত জোড় করে বললে, 'মজন্তালী মশাই, ঘাট হয়েছে এবারে মাপ করুন। ওটা মূর্খ, লেখাপড়া জানে না, তাই কি করতে কি করে ফেলেছে।'

মজন্তালী বললে, 'আচ্ছা, এবারে মাপ করলুম। খবরদার! আর যেন কখনো এমন হয় না।' এই বলে মজন্তালী তার ভিজে গা শুকাবার জন্যে রোদ খুঁজতে লাগল।

ভারি বনের ভিতরে সহজে রোদ ঢুকতে পায় না। সেখানে রোদ খুঁজতে গেলে উঁচু গাছের আগায় গিয়ে উঠতে হয়। মজন্তালী একটা গাছের আগায় উঠে দেখলে যে, এই বড় এক মরা মহিষ মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে। তখন সে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মহিষটার গায় কয়েকটা আঁচড় কামড় দিয়ে এসে বাঘিনীকে বললে, 'শিগগির যা, আমি একটা মোষ মেরে এসেছি।'

বাঘিনী আর তার ছানাগুলো ছুটে গিয়ে দেখলে, সত্যি মস্ত এক মোষ পড়ে আছে। তারা চারজনে মিলে অনেক কষ্টে সেটাকে টেনে আনলে, আর ভাবলে, 'ঈস! মজন্তালী মশাইয়ের গায়ে কি জোর!'

আর একদিন তারা মজন্তালীকে বললে, 'মজন্তালী মশাই,

এ বনে বড়-বড় হাতি আর গণ্ডার আছে। চলুন একদিন সেইগুলো মারতে যাই।'

একথা শুনে মজন্তালী বললে, 'তাই তো, হাতি গণ্ডার মারব না তো মারব কি ? চল আজই যাই।'

বলে সে তখুনি সকলকে নিয়ে হাতি আর গণ্ডার মারতে চলল। যেতে-যেতে বাঘিনী তাকে জিগগেস করলে, 'মজন্তালী মশাই, আপনি খাপে থাকবেন, না ঝাঁপে থাকবেন ?' খাপে থাকবার মানে কি ? না—জন্তু এলে তাকে ধরে মারবার জন্যে চুপ করে গুড়ি মেরে বসে থাকা। আর ঝাঁপে থাকার মানে হচ্ছে, বনের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে জন্তু তাড়িয়ে আনা।

মজন্তালী ভাবলে, 'আমার তাড়ায় আর কোন জন্তু ভয় পাবে ?' তাই সে বললে, 'আমি ঝাঁপিয়ে যে সব জন্তু পাঠাব, তা কি তোরা মারতে পারিস ? তোরা ঝাঁপে যা, আমি খাপে থাকি।'

বাঘিনী বললে, 'তাই তো, সে সব ভয়ানক জন্তু কি আমরা মারতে পারব ? চল বাছারা, আমরা ঝাঁপে যাই।'

এই বলে বাঘিনী তার ছানাগুলোকে নিয়ে বনের অন্য ধারে গিয়ে ভয়ানক 'হাল্লুম-হাল্লুম' করে জানোয়ারদের তাড়াতে লাগল। মজন্তালী জানোয়ারদের ডাক শুনে একটা গাছের তলায় বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

খানিক বাদে একটা সজারু সড়-সড় করে সেই দিক পানে ছুটে এসেছে, আর মজন্তালী তাকে দেখে 'মাগো' বলে সেই গাছের একটা শিকড়ের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে, এমন সময় একটা হাতি সেইখান দিয়ে চলে গেল। সেই হাতির একটা পায়ের

এক পাশ সেই শিকড়ের উপরে পড়েছিল তাতেই মজন্তালীর পেট ফেটে গিয়ে বেচারার প্রাণ যায় আর কি!

অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে বাঘেরা ভাবলে, 'মজন্তালী মশাই না জানি এতক্ষণে কত জন্তু মেরেছেন, চল একবার দেখে আসি।' তারা এসে মজন্তালীর দশা দেখে বললে, 'হায়-হায়! মজন্তালী মশায়ের এ কি হল?'

মজন্তালী বললে, 'আর কি হবে? তোরা সব ছোট-ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিলি। দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটই ফেটে গিয়েছে।'

এই বলে মজন্তালী মরে গেল।

বানর রাজপুত্র

এক রাজার সাত রানী, কিন্তু ছেলেপিলে একটিও নেই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ; তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা কন না।

একদিন হয়েছে কি—এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা তোমার মুখ ভার দেখছি; তোমার কিসের দুঃখ!'

রাজা বললেন, 'সে কথা আর কী বলব, মুনিঠাকুর! আমার রাজ্য, ধন, লোকজন সবই আছে, কিন্তু আমার যে ছেলেপিলে নেই, আমি মরলে এসব কে দেখবে?'

মুনি বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা, তোমার কোনো চিন্তা নেই। কাল ভোরে উঠেই তুমি সোজাসুজি উত্তর দিকে যাবে। অনেক দূরে গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আমগাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে সাত রানীকে

বেটে খাইয়ে দিলেই তোমার সাতটি ছেলে হবে। কিন্তু খবরদার আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন !'

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তারপর দিন গেল, রাত ভোর হল। তখন রাজামশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজাসুজি উত্তরে দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূরে গিয়ে তিনি দেখলেন সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আমগাছ আছে, তাতে পাকা পাকা সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কতবার শিকার করতে এসেছেন, কিন্তু আমগাছ কখনও দেখতে পাননি। যা হোক, তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে চললেন।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই শুনলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

'ওগো রাজা, ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।'

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না। তিনি পিছন থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে। কাজেই রাজামশাই-এর আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হল। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসবার সময় পিছন থেকে তাঁকে কত রকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর' 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজামশাই তাতে কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ির পানে ছুটলেন।

বাড়ি এসে রানীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে রাজামশাই বললেন, তোমরা সাতজনে এই সাতটি আম বেটে খাও।'

ছোট রানী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রানীরা ছ-জনে

মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেললেন। ছোট রানী এর কিছুই জানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রানীদের খাওয়া হয়ে গেলে সে আমের ছালগুলি চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে বেটে ছোট রানীর হাতে দিয়ে বলল, 'মা, এই ওষুধটা তুমি খাও, তোমার ভাল হবে।' ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোট রানী আর কোনো কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেললেন।

তারপর বড় রানীদের সকলেরই এক-একটি সুন্দর খোকা হল, রাজা তাতে খুশী হয়ে খুব ধুমধাম আর গানবাজনা করালেন। ছোট রানীর একটি খোকা হল, কিন্তু সেটি হল বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে রানীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হল। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোটরানীকে বলল, 'মা, তুমি এইখানে থাকো।'

সেইখানে ছোটরানী থাকেন। বানরটি সেখানে থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের মতো কথা কয়। আর তার এমন বুদ্ধি যে কোনো কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে-গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়; খুব ভাল লাগলে মার জন্যে নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর কারুর গাছে ফল খেতে গেলে সে ভারী খুশী হয়ে ভাল-ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রানীদের ছটি ছেলেও এখন বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যারপর-নাই হিংসা করে। সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর একদিন বানরটি দেখল যে বড় রানীদের ছেলেদের জন্য মাস্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে পুঁথি এনে দাও, আমি পড়ব।'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায় বাছা, কী করে পড়বে? তুমি যে বানর।'

বানর বলল, 'সত্যি মা আমি পড়ব; তুমি বই এনে দিয়েই দেখো। তুমি আমাকে পড়াবে।'

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেলে। সে দু-বছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রানীদের ছেলেরা তখনও দু-তিনখানি বই পুঁথি শেষ করতে পারেনি; রোজ খালি মাস্টারের বকুনি খায়।

এসব কথা শুনে রাজা একদিন বললেন, 'বটে? বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এসো তো তাকে, আমি দেখব।'

বানরের কিছুতেই ভয় নেই; রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোট রানীকে কুঁড়ে ঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়িতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রানীরা কিছু বলেন। তাই তিনি ছোট রানীকে রাজবাড়ির পাশেই একটি খুব সুন্দর বাড়ি করে দিলেন। সেই বাড়িতে তখন থেকে ছোট রানী তাঁর বানর নিয়ে থাকেন। টাকা-কড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায়; লোকে তাঁর বাড়িটাকে বলে বানরের বাড়ি। এসব দেখে বড় রানীদের ছেলেরা আরও বেশী হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা সব বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বলল, 'রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এঁদের বিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তাদের দেশ-বিদেশ ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে নানান রকম শিখে, টুক্‌টুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আনুক।'

সকলে বলল, 'বেশ বেশ! তাই হোক।'

তারপর ছয় রাজপুত্র সেজেগুজে, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নানান দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে বলল, 'মা, আমিও যাব।'

তার মা বললেন, 'তুমি কি করতে যাবে যাদু, তোমাকে কোন্‌ টুকটুকে রাজকন্যা বিয়ে করবে?'

মা বললেন, 'তুমি যে দেশ দেখতে যাবে, আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকবে?'

বানর বলল, 'আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে যেতে দাও!'

কাজেই ছোট রানী আর কি করেন? বানরকে যেতে দিতেই হল।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে; রাজবাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথে চলতে চলতে তাদের নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বানর বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আমিও এসেছি আমাকে নিয়ে চলো!'

তাতে রাজপুত্রেরা যারপরনাই রেগে বলল, বটে রে, তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি!'

এই বলে তারা বানরকে মারতে মারতে আধমরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেই বনে ছিল একদল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয়জন রাজপুত্র ভারী সাজ করে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই তো তারা মার-মার করে চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড়োসড়ো, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকাকড়ি, ঘোড়া, পোশাক —সবসুদ্ধ তাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু-মিনিটও লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে নিয়ে চলল। বানর যেন তাতে বেশ খুশী হয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতেরা ভাবল, বুঝি কারু পোষা বানর। কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

সেই বনের ভিতরেই ডাকাতদের ঘর। সেদিন তাদের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধনসুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তারা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে, তখন বানর চুপিচুপি তার বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন্ লাজে? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিসপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল, ডাকাতেরা কিছু টের পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা প্রাণপণে

ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থামল না। সকালে তারা দেখল যে চমৎকার একটা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেন একটা ঝকঝকে সাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ির কাছে গিয়েই টকটক করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দারোয়ানরা তাদের পোশাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড়োসড়ো হয়ে তাদের সেলাম করল, আর কিছু বলল না। বানর কিন্তু জানে যে সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে; তাই সে বাড়ির পেছনের দিকে গিয়ে খিড়কির পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।

সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রানী। তাদের বড় ছ'জন ছিল ভারী হিংসুক আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মতো সুন্দর আর বড় লক্ষ্মী। বড়রা রাজাকে মিছিমিছি নানান কথা বলে, ছোটরানীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; তিনি খিড়কির পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতর থাকতেন, রাজা তাঁর কোনো খবরও নিতেন না। বড় ছয় রানীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখতে ছিল ঠিক তাদের মায়েদের মতো, আর তাদের মনও ছিল তেমনি। আর ছোটরানীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মার মতো—যেমনি সুন্দর, তেমনি লক্ষ্মী। তাহলে কী হয়, বড় রানীরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কানা, খোঁড়া, কালা আর বোবা।

সেই খিড়কির পুকুরের ধারে, সেই ছোট রানীর কুঁড়েঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রানীদের

ছয় মেয়ে ছটি ঘটি নিয়ে সেখানে স্নান করতে এল, ছোট রানীর মেয়েটিও তার ছোট্ট ঘটিটি নিয়ে এল। তারা স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েটির ঘটি থেকে কেমন করে খানিকটা জল বানরের গায়ে পড়ে গেল। অমনি বড় রানীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওমা! ওমা! তোমরা দেখো এসে—ছোট রানীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে।'

বড় রানীরাও তা শুনে ছুটে এসে বলতে লাগল, 'তাই তো, তাই তো। ছোট রানীর মেয়ে বানরটাকে বিয়ে করেছে!'

সেই খবর তখনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজার সভায় বসে শুনল যে ছোট রানীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোট রানীর মনে যে কী কষ্ট হল, তা আর কী বলব? তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোড় করে বলল, 'মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন; এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মতো কথা কইতে দেখে রানী উঠে বসলেন! তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই থেকে বানর তাঁর ঘরের কাছে গাছের ওপর থাকে আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে! রানী যখন শুনলেন যে সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর সে কথা তিনি ভুলে গেলেন; তাঁর মনে হল যে এমন ভাল আর বুদ্ধিমান লোক মানুষের ভিতরে নাই।

এদিকে হয়েছে কী, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়িতে ঢুকে একেবারে তাঁর সভায় এসে হাজির হয়েছে; রাজা তাই দেখে বুঝতে পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'বাপু তোমরা কে ? কী করতে এসেছ ?' তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুনলেন, আর শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্য রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন তো আর তাঁর খুশির সীমাই রইল না ! তিনি বললেন, 'বাঃ ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে ! বেশ হল ; আমার ছয় মেয়েকে তোমরা ছ-জনে বিয়ে করবে।'

ঠিক এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোট রানীর মেয়ের একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্ররাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরই বাঁদর। তাদের মনে হিংসাটা যে হল! বাঁদর এসে তাদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেলল,—লোকে আবার কানাকানি করে বলে যে, সে মেয়ে নাকি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর আর আরো ভালো—এসব কথা তারা যত ভাবে ততই খালি জ্বলে মরে।

যা হোক, রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে তো তাদের ছয়জনের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর ঝকঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে তারা বউ নিয়ে দেশে চলল। বানরও একটি ছোট নৌকায় করে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু-পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভূত হয়ে গেছে, আর ভেবেছে যে একে বউ নিয়ে দেশে পৌঁছতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই-ভাই' বলে ভারী আদর দেখাতে লাগল, যেন তাকে কতই ভালবাসে! শেষে যখন বাড়ির কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস, ছোটবউ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে কোনমতে ডাঙায় উঠল, নইলে সে যাত্রা আর উপায় ছিল না।

তারপর সকালবেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগল, রাজা খবর পেয়ে ছেলে-বউদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বানর কই?' তারা বলল, 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে!'

বানর তো মরেনি, সে নদীর ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। ওরা 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে' বললেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আমি মরিনি বাবা, ওরা আমায় হাত-পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি!

তখন তো রাজপুত্রদের মুখ চুন। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বললেন, 'বটে! তোদের এই কাজ? দূর হ তোরা আমার দেশ থেকে, আর তোদের মুখ দেখব না।'

এই বলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা যারপরনাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে এমন সুন্দরী লক্ষ্মী বউ ঘরে এনে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

তারপর খুব সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কী, বউমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায়, রাত্রে সে বানরের ছাল খুলে ফেলে দেবতার মতো সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোট রানীকে বললেন, ছোট রানী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা তো শুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে এসে বললেন, 'বউ-মা, তুমি এক কাজ করো। আজ রাত্রে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটিকে পুড়িয়ে ফেলবে।'

সেদিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জ্বেলে রাখা হল, বানর তা জানতে পেল না। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে, অমনি রাজকন্যা চুপিচুপি সেটাকে নিয়ে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে উঠে দেখে তার ছাল নেই! তখন সে তো ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হল, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কী হবে, আর বানর হবার জো নেই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, আর ছেলেবুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব দেখেশুনে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল।
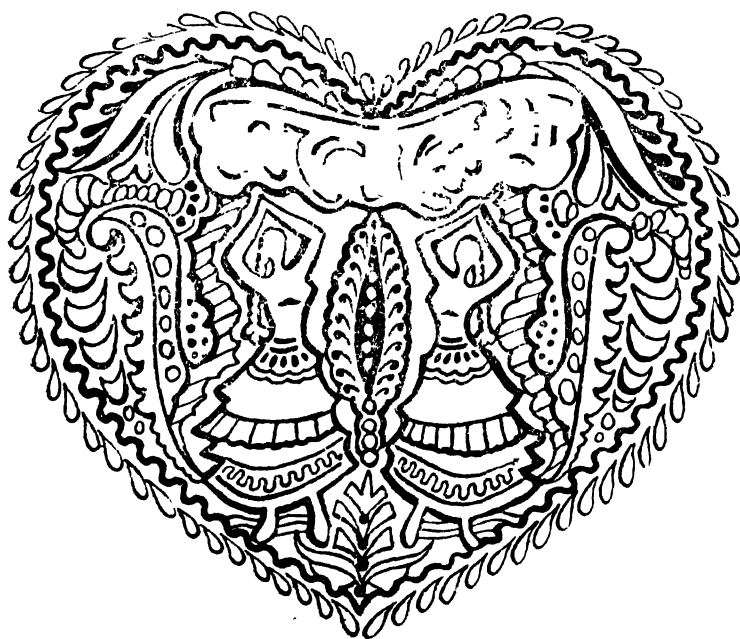
রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিল, সন্ধ্যায় সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এসে রেখে দিলে, আর ভাবলে, 'ঈস্! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সেই ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরে সে ধন আছে!

রাজা তাঁর সভায় বসে সে-কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, হ্যাঁরে! পাখিটা কি বলছে রে?'

সকলে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, পাখি বলছে,

'আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে।' শুনে রাজা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কি আছে।'

তারা দেখে এসে বললে, 'মহারাজা, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কি করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিল বাড়ির ভিতর।

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাটা রে! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরিয়ে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

রাজা জিগগেস করলেন, 'আবার কি বলছে রে?

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কি এত বড় কথা! আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই।'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানীদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে!'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানীরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কি সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফস্‌কে গিয়ে উড়ে পালাল।

কি সর্বনাশ! এখন উপায় কি হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না।

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ-থপ করে যাচ্ছে। তার রানী তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, 'চুপ-চুপ। কেউ যেন জানতে না পারে। এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভাবি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবারে পাখির বাচ্চাকে জব্দ করেছি।'

অমনি টুনি বলছে—

বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন। তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন আর কত কি করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রানীর নাক কেটে ফেল।'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানীর নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রানীর নাক কাটল !

তখন রাজা বললে, 'আন বেটাকে ধরে! এবারে গিলে খাব! দেখি কেমন করে পালায়!'

টুনটুনিকে ধরে আনল।

রাজা বললেন, 'আন জল!'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবারে পাখি জব্দ!'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল! ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনল।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু টুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল।

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক্!' অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরেও সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, 'সিপাই, সিপাই! মারো, মারো। পালালো!'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায় না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক-কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!

বলেই সে উড়ে সে-দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন-জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়; এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটি লেবু! সে কোন লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথাই জানাইয়া দিলেন যে, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে

ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষীর বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষী অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর লেবু তাহাতে হইয়াছে। লেবু তো নয় যেন রসগোল্লা! এক-একটা বড় কত! যেন এক-একটা বেল। তেমন লেবু তোমরা দেখ-ও নাই, খাও-ও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষীর তিন ছেলে; যদু, গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষী যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল যে, শীগ্‌গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'
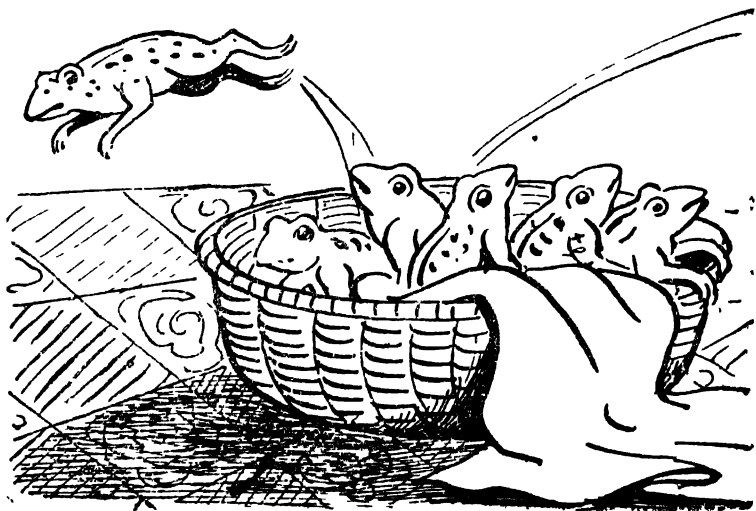
যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ঝুড়িতে কি-ও!' যদু বলিল 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজার দারোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যারপরনাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজামহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন; আর অমনি চারটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যত লেবু ছিল সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে-প্রাণে বাড়ি ফিরিল তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এর পর চাষী আর-একঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই এক হাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি।' একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়ির দারোয়ানরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল যে, 'তারই মতন একটা লোক সেদিন এসে রাজা-মশায়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তাই আবার একটা কি করে বসবি কে জানে।' অনেক পিড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে কাজেই তাহাকে লেবুর ঝুড়ি দিয়ে রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া-গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষী তাহাকে যাইতে বলিল ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও একঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই এক হাত মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। এক হাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝুড়িতে কি-ও?' মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' এক হাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যারপরনাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাতজোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি

ঝিঙের বীচি-টিচি হয় না তাহলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামহাশয় তো খুবই খুশী! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, কেমন হয়, আমাকে খবর দিস।' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত। সেই লেবু মুখে দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে।

ইহাতে রাজামহাশয় যারপরনাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই তো, করিয়াছি কি? এখন যে চাষীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়।' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে, চাষীর ছেলেকে যেমন করিয়া হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে যে, 'এর পরই বুঝি মেয়ের বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজামহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর-একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমন চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া দিতে না পারিলে তোমার কোন আশাই নাই।

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাৎ বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মানুকে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা

করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখন নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে; পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই এক হাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে?' 'গামলা' 'আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া এক হাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল, যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মতো গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন-চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল ঃ এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই এক হাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল, 'জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজামশাই

বলেছেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন।' এই কথা শুনিয়া এক হাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। এক হাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সে কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজারাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর তাহা কি বলিব! যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা-মহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না; আর একখানা কাজ করিয়া দিতে হবে। একগাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে। মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখী, খানিকটা জানোয়ার, বিদঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারী জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে,

সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই রসগোল্লাটির মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে-বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারও বাড়িতে আশ্রয় লইতে হয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথা-বার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঁঘা তার কোনো সন্ধান বলতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা কোরো তো।' মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর-একদিন সে আর-এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার ব্যারামটা যে-কি কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের 'অসুখ কিসে সারবে এই একটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছে থেকে জেনে আসতে পার তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলিল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব!'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপরে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা

নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই ; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহার কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, বাপু, আমার এই দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিগ্যেস কোরো তো। আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই খালি কাঁধে করে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিগ্যেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না, ঘেঁঘী ছিল। তখন তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শীগ্‌গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিল্‌বে।' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন করে যাব ? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সে চাবিটি কোথায় আছে ? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার করে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন করে ?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে এক-শ খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু ?' মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না ; একগাছি পালক আমার চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক্। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।' মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে ; সব তাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই!

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পালাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছুটা শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে ; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে! হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হইয়াছে অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে টান পড়েছে। আর মানুষ তো একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। 'সেই কাদের বাড়ির লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি। আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ—।' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, 'কোলা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে—?' ঘ্যাঁঘা বলিল, 'সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না। তাহলেই সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে।'

মানিকের সকল কাজ আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল?' মানিক বলিল, 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এর পর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তাহলেই তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোলা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে মড়ার মতন পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশী হইল, তাহা কি বলিব! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বইতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যারপরনাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে। তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। রাজামহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন যে, ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা আনা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে পারেন নাই। কারণ অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর

হাতজোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসর পায় নাই ; ততক্ষণে সে ডাঙায় উঠিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি পানে ছুটিয়াছে, তাড়াতাড়ি রাজা-মহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করাইতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনও ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুক যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

প্রথম দৃশ্য

(জামা রিপু করিতে করিতে কেনারাম চাকরের প্রবেশ)

কেনা। ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল! ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়, তা রিপু করব কি? ভাল মনিব জুটেছে যাই হোক,—এই জামাটা দিয়েই ক-বছর কাটালে। তিন বছর তো আমিই এই রকম দেখ্‌ছি, আরও বা ক-বছর দেখতে হয়! তবু যদি চারটি পেট ভরে খেতে দিত! তাও কেমন? সকালে মনিব চারটি ভাত খান, আমি, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্তিরে তিনি হাঁড়ি চাটেন, আমি শুঁকি। তার উপর শ্রবণশক্তিটি কী প্রখর! বাড়িওয়ালা সেদিন টাকার জন্যে কী-ই না বললে। বাড়িওয়ালা বলে, 'টাকা দেও, ঢের টাকা বাকী।' মনিব বলেন, 'তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ি আজ নেমন্তন্ন?' বাড়ি-

ওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলবে কৈ?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা চাকরটিও সঙ্গে যাবে। বাড়িওয়ালা বেচারি রেগেমেগে চলে গেল। বড়লোক হতে হলে বোধহয় আমার মনিবের মতোই কত্তে হয়, কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড়লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড়লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ তিন বছরে একটি পয়সা মাইনে দিলে না। দেখি আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ হচ্ছে না।

[প্রস্থান।

(বেচারাম মনিবের প্রবেশ)

মনিব। চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথাই বলছিল! সব শুনেছি। বেটা ভেবেছে, আমি সত্যিই কালা। আরে আমার মতো যদি কান থাকত তা হলে আর চাকরি করতে হত না। আমি যা করে খাই, তাই করে খেতে পাও। ঘরের ভিতর ক-জন লোক ক-জন জেগে আছে, ক-জন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি। কোথায় সিন্দুকের ভেতর আরশুলা কড়কড় কচ্ছে, বাইরে থেকে বুঝেনি। বাপু হে! কানে শুনি, কানে শুনি। কানে শোনাটা তো বেশ ভালই, কিন্তু না শোনার যে সুবিধা আছে, তা তো বুঝবে না? এই সেদিন বাড়িওয়ালা বেটা ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় কত্ত! কানে না শোনার কত সুবিধে দেখো, পাওনাদারের টাকা দিতে হয় না, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, চাকরের মাহিনা দিতে হয় না—

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। (উচ্চৈস্বরে) মশাই, হয় এই তিন বছরের মাইনে দিন, না হয় আপনার সব রইল, আমি চললেম।

মনিব। ডাকওয়ালা ? ঠিক ? দেখি ?

কেনারাম। (স্বগত) এই মুশকিল কললে ! তা এবারে বাপু এক ফন্দি এঁটেছি—সব লিখে এনেছি। (প্রকাশ্যে) চিঠিই বটে, এই নিন।

মনিব। (পাঠ) 'মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসরের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।'—তাই তো, তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় তো কোনো বন্দোবস্ত হয়নি, কাজকর্মও তেমন ভাল করনি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশি তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নেও। (তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। এই বড়লোক হলাম আর কি। তিন-তিন বছরের মাইনে ; ঢের টাকা—ঢের টাকা। এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়, দশ এগার বার। (পয়সা তিনটি পকেটে স্থাপন)

(ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূতের প্রবেশ)

স্বর্গীয় দূত। আরে ভাই, তোর যে ভারি ফুর্তি ?

কেনা। কে-ও ? ছোট্ট মানুষ ? দাঁড়াও চশমাটা বার করেনি।

দূত। কেন ! চোখে দেখ্ না বুঝি ?

কেনা ! তা কেন ? বড়লোক হয়েছি যে, ছোট মানুষ আর তেমন চোখে মালুম পড়ে না।

দূত। বটে এত বড়লোক কী করে হলি ভাই ?

কেনা। (পকেট চাপড়াইয়া) তি—ন—টি ব—ছ—রে —র—মা—ই—নে। (এক-একটি পয়সা বহিষ্করণ ও গম্ভীর ভাবে গণন) এ—এ—এ—ক, দু—উ—উ—ই, তি—ই—ই —ন (পকেট উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান)

দূত। তাই তো ভাই, এত টাকা নিয়ে তুই কি করবি ? আমি গরীব, আমাকে কিছু দে-না ?

কেনা। নিবি ? এই নে ; ভগবান আমাকে খেটে খাবার শক্তি দিয়েছেন, খেটে খাব। (পয়সা তিনটি প্রদান)

দূত। তুই ভাই বেশ লোক, তোর মনটা খুব খোলা। আমি ঈশ্বরের দূত, লোক দেখলে পুরস্কার দি। তোর ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি, তুই কী চাস্ বল্—যা চাস তাই পাবি।

দূত ! তোর কিছু ভয় নেই, আমাকে "তুই" "তুমি" যা খুশি বল, কিছুতেই বেয়াদবি হবে না ; এখন তুই কী নিবি বল্।

কেনা। তা দাদা, যদি দেবে তবে এমন একখানা বেহালা দাও যে, যে তার আওয়াজ শুনবে তাকেই তিড়িং তিড়িং করে নাচতে হবে।

দূত। (ঝুলি হইতে বেহালা বাহির করিয়া) এই নে।

কেনা। বাঃ বেশ হল, আমাকে তো সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে না ?

দূত। না, সে ভয় তোর নাই, যা, এখন ফুর্তি করগে। (দূতের প্রস্থানোদ্যম ও কেনারামের বাদ্যোদ্যম) আরে দূর হতভাগা, আমারই উপর পরীক্ষা করে বসলি !

কেনা। তুমিই যে ফুর্তি করতে বললে দাদা।

দূত। আমি আগে যাই, তারপর করিস।

কেনা। আ—চ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। ঐ ঝোপটাতে ফেলে গিছলুম) পুলিশ বেটা এমনি তাড়া করলে, ধরেই ফেলেছিল আর কি। চট করে টাকার থলেটি ঐ ঝোপটাতে ফেলে পালালুম, এখন পেলে বাঁছি। (থলি খুঁজতে ঝোপে প্রবেশ) বাপ রে, ভয়ানক কাঁটা,—এই পেয়েছি!

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। (স্বগত) ঐ যে বেচুবাবু কাঁটাবনে ঢুকেছেন; এইবারে এক গং বাজিয়ে নি, পুরানো মনিবটে! (বেহালা বাদন)

বেচা (নৃত্য করিতে করিতে) আরে! আরে। ও কী? উঃ আঃ। আরে তুমি কি—উঃ হু হু—আরে আর না—জামাটা—উঃ—হু জামাটা গেল যে, উঃ—গায়ের চামড়াও যে ছিঁড়ে গেল—উঃ!

কেনা। আজ্ঞে, আমি আপনার বকেয়া চাকর কেনারাম, মাইনে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে কি এমন মনিবকে ভুলতে পারি? আপনাকে বাজনা শুনিয়ে আমার বেহালা সার্থক হল। (পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বাদন)

বেচা। (নৃত্য) কী মুশকিল। বাবা কেনারাম, রক্ষে করো বাবা। এ কী বাজনা শুনলেই নাচতে হয়। বাবা আর কাজ নেই, আমি খুব খুশি হয়েছি, এই টাকার থলি তোমায়

দিচ্ছি, তোমার মাইনে এ থেকে পুষিয়ে নাও, দোহাই বাবা আমায় নাচিও না। (টাকার থলি কেনারামের হাতে প্রদান)

কেনা। (বিনীত অভিবাদন করিয়া) আজ্ঞে না হবে কেন? আপনার মতো মনিব না হলে গুণ কে বোঝে। দেখছি বেহালার আওয়াজে আপনার 'কানে-খাট'র ব্যারামটাও বেশ সেরে গেল। ভাল, আর এ ব্যারামের সূত্রপাত দেখলে আমায় খবর দেবেন, আমি বেহালা নিয়ে এসে চিকিৎসে করব। (দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

বেচা। হতভাগা বেটা, লক্ষ্মীছাড়া বেটা, জোচ্চোর, বাটপাড়, ডাকাত—বেটাকে দেখাচ্ছি। পুলিশ। পুলিশ। চোর—চোর।

চতুর্থ দৃশ্য

(বিচারালয়ঃ ব্যস্তভাবে বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। দোহাই হুজুর, আমাকে ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও-হো হো। (ক্রন্দন)

বিচারক। আরে ব্যাপার কী? তোমার কী হয়েছে?

বেচা। (কাঁটার আঁচড় ও ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখাইয়া) আর কী হবে, আমি ধনে-প্রাণে গিয়েছি। বড় রাস্তার ধারে ঐ কেনা বেটা আমাকে মেরে-ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে—এঁ-হেঁ-হেঁ (ক্রন্দন)। বেটাকে তিন বছর খাইয়ে মানুষ করলুম, আর তার এই পরিশোধ দিলে। বেটা দিনরাত বেহালা নিয়ে ফেরে এখনি ধরতে পাঠান, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন।

বিচারক। চারজন লোক এখনি গিয়ে কেনারামকে নিয়ে এসো!

(কেনারামকে লইয়া চারজনের প্রবেশ)

বেচা। ঐ। ঐ। ঐ বেটা হুজুর। ঐ কেনারাম বেটা আমার সর্বনাশ করছে, বেটাকে আচ্ছা করে—

বিচারক। চুপ। (কেনার প্রতি) তুমি একে মেরে এর টাকা কেড়ে নিয়েছ ?

কেনা। সে কি ? হুজুর। উনি আমার বেহালা বাজানো শুনে আমায় এক থলি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন—আমি যথার্থ বলছি।

বিচারক। ওর যে চেহারা দেখছি, তাতে ও বেহালা শুনে তোমায় এতগুলো টাকা দিয়েছে তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস কত্তে পারিনে। আর ওর গায়েও এই সব দাগ দেখছি। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে তুমি ওকে মেরে টাকার থলি কেড়ে নিয়েছ। এ ডাকাতি। ডাকাতির শাস্তি ফাঁসি,—তোমার ফাঁসি হবে। এখন তোমার যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে তো বলো !

কেনা। হুজুর আমার আর কোনো সাধ নেই। খালি জন্মের মতো বেহালাখানা একবার বাজাতে চাই।

বেচা। সর্বনাশ। হুজুর, এমন হুকুম দেবেন না।

চাপরাশী। (বেচারামকে রুলের গুঁতো মারিয়া) চুপ রও।

বিচারক। আর কোনো সাধ তোমার নেই ? আচ্ছা, বাজাও।

(কেনারামের উৎসাহের সঙ্গে বেহালাবাদন ও বিচারক হইতে চাপরাশী পর্যন্ত সকলের নৃত্য)

বিচারক। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আরে বাপু থাম্ থাম্ ; শীগ্‌গির থাম্ ; তোকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি, প্রাণ যায় থাম্। বাপ রে, এ কী রকম বেহালা বাজনা।

কেনা। (সেলাম করিয়া) । বেচুবাবুকে এখন সমস্ত সত্য ঘটনা বলতে হুকুম হয় নইলে আমি পুনরায় বেহালায় ছড়ি দিলাম।

বিচারক! (বেচারামের প্রতি সরোষে) বল্ বেটা কী হয়েছিল, সত্যি করে এখনি বল্।

বেচা। ওগো, না গো, আর বেহালা ধরো না। ও টাকা আমিই দিয়েছি—দিয়েছি।

বিচারক। তুই এত টাকা কোথা পেলি, বল্।

বেচা। আমি—আমি—

কেনা। এই বেহালা ধরছি!

বেচা। না—না—আমি, হুজুর আমি—কাল রাত্তিরে হুজুর, চুরি করেছিলাম। হুজুর।

কেনা। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। দেখলেন তো বেচুবাবু?

বিচারক। একে পঁচিশ ঘা বেত মারো।

দুঃখীরাম খুব গরীবের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল, সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দু-বছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোনো খবরই লইত না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরিবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে

লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া-দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার একজন মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই তো, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা তো জান না। আমরা যে মাসে একদিন খাই। কাল খেয়েছি, আবার দু-মাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলল, 'মামা, তার জন্য ভাবনা কী? তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না, দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাতো ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাতো ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছুই খাইল না। কাজেই দুঃখীরামের খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশী সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড়-একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল 'মামা আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারী খুশী হইল, আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমোয় নাই,—মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এর পর মামা কী করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল, দাদা ঘুমাইয়াছে। এর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে এবারে মামা উঠিয়াছে। তারপর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ—সকলই শুনা গেল। দুঃখীরামের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপি চুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটো দিয়া দেখিল, কেষ্ট পায়স রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে দুঃখীরাম, কী হইয়াছে ?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কি করছিলে, আর-একজন লোক খালি বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই সে লাঠি হাতে ঘরের পেছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা শীগ্‌গির ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথাও
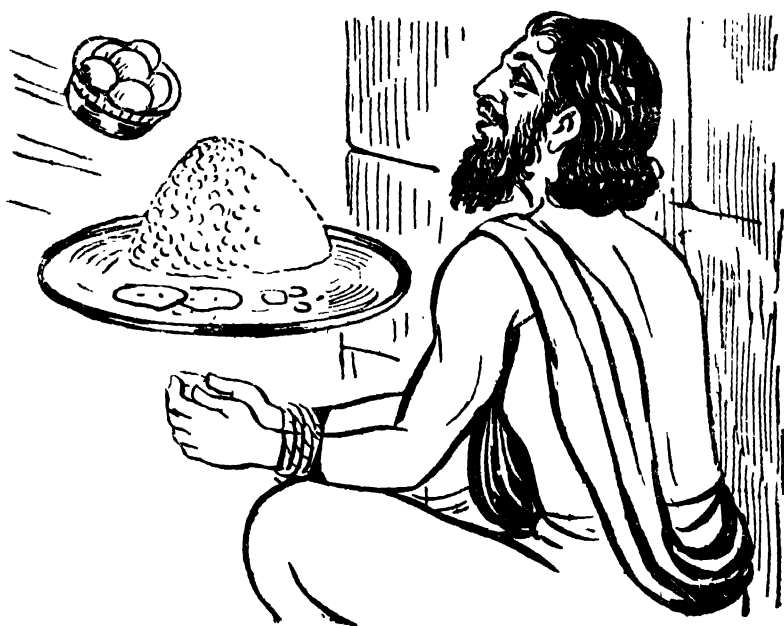
গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়তো হঠাৎ তাহার কোনো ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে তো ধরতে পারেই নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে ?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তুমিও গেলে আর যে লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সে লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল। আর দাদাও তখখুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয় পাড়ার দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল, যে মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্না ঘরে গিয়া পায়সের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আবার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে দেখিতে সেই পায়সের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তার পর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া

খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া শেষে রান্না ঘরে গিয়া সে দেখে পায়সের হাঁড়ি খালি। তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়-চোখে চায়, আর-একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামেরই কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপ-বেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়স চুরি করে কেন খেলি? আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি?'

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার! ওঁরা দু-মাসে একদিন খায়। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়স রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন! তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, তাতে যদি ওঁরা খামকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কী দোষ।'

রাজা আগাগোড়া শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল, যে কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোট মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কি করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড় মন্ত্রীর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষীরাজ ঘোড়া মানুষের মতো কথা কহিতে পারে, শূন্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে আর ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রী মহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রী মহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একট আমের আঁটি আনিয়াছ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রী মহাশয় নাক-মুখ সিটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার

বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, 'আচ্ছা বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয়তো কি হইবে? মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি আমার কথা সত্য হয়?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরেব বাড়িতে মন্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কী হইল তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে আর পক্ষীরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোনো উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে একটা উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সুখে নিদ্রা গেল!

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রী মহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রী মহাশয়ের একটু বসিবার দেরী হয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কি হইল?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে

পারেন।' মন্ত্রী মহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন, সওদাগরও সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রী মহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কী বন্ধু। আপনার মতোন লোকের ঐ সামান্য দড়িগাছটায় লোভ! একটা কোনো দামী জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর তো চক্ষু স্থির! অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা-আমতা করিয়া তিনি ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রী মহাশয় স্থির করিলেন যে ছোট মন্ত্রী ছাড়া আর কাহারও কর্ম নয়, তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুর বেলা রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রী মহাশয় গিয়া জোড় হাতে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি বড় মন্ত্রী!' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ। সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে, কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষীরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই চাই!' মন্ত্রী আরও বিনয় করিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন, 'মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোট মন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেন।' রাজা বলিলেন, 'সে কী রকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়ে সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।'

রাজাদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিস দিতেন তো অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন তো মাথাটাই কাটাইয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিত না, সুখে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজা মহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে, 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপিচুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাল লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর একটুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রী মশাই, আমরা আর তোমাকে কী দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রী মশাই আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকে

রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে লম্বা লম্বা চুল-দাড়ি-গোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে চট করিয়া চেনায় যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ী ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়ী হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনও দেখে নাই। বুড়ীকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, যে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ চুপি চুপি সেই বুড়ীর দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়ে সাপটাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া দিল! কী আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবা মাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ী খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম।' বুড়ী বলিল, 'বাবা, তুমি কী চাও?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি কিছু চাই না। তুমি বুড়ো মানুষ, বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তু-টন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ী বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।'

দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবে না, সুতরাং বুড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে এক বর দিয়া যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণ কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রি হইবে তবে তাহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ সকল কথা ভাবিয়া বেচারীর মনটা একটু দুঃখিত ছিল; তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়াছিল, তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভাল নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল।'

যেই এ কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছ পালা সব কোথায় চলিয়া গেল। যেখানে যত বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধু ধু করিতে লাগিল। কী সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কী করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপন মনে খালি হাঁটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরও বেশী হইয়াছে এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল; সে যে-সে কুড়াল নয় জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দু-খানার সমান তাহার একখানা ভারী হয়।

সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মতো ভারী ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি আর পারি না, অত ভারী কুড়ালের হাত-পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতোন তাহার সব পা হইল, আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু-পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরও গোল লাগিয়া গেল। সে একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, হইল কী!

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে; সে এমনভাবে চলিযাছে, যেন চিরকাল তাহার ঐ রকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কী কর? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কী করে? বাজারের প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দারোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পাসুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত! 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত-পা উর্ধ্বে উঠাইয়া দারোয়ানজী অমনি এক লাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দারোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে ফেলিয়া

ঘরের দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দু-জনেই তাহার পিছু-পিছু তামাসা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু-পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার-করা আর হয় নাই। দোকানীরাও তাহাই করিতেছে—পুলিশ-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাসা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় সকল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা কেষ্ট আর মামাতো ভাই হরিও তাহাদের ভিতর ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়োলের তামাসা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার সেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল যে, 'মন্ত্রী মহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনও হাঁটে। এ নিশ্চয় কোনো জাদু-টাদু শিখিয়া বদমতলবে এখানে আসিয়াছে!' রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী। এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মতো দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহারা কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সেই কুড়ালের গায়ে কী ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পা-ও নাড়িতে পারিল না, বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইলখানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছু আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এর পর কী হয়। স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যের বেলা বলা সহজ; তোমাকে একবার ও রকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রী মহাশয়কে চিত করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখীরামের মতোন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রী মহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন; কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রী মহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না। চোখ দুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর দেখিল যে দু-জনকে ঠিক এক রকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে

কিনা। যখন দেখিল যে দু-জনকে ঠিক এক রকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজা মহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে সকল পালোয়ান মন্ত্রী মহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দেবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে রাজা মহাশয় মাঝখানে উঠিয়া গেলেন। ঠিক হইল খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কী বলিব! অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা সে ভাবে না; কিন্তু ক্ষুধা তো কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজা মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আহা, ওসব জিনিস যদি এখন আনিয়া দিত?'

রাজা মহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে কত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজা মহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাশুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল! মন্ত্রী

মহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ হইতে না হইতে তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর খাবারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না; তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল, 'হায় রে হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে এক লাফে উঠিয়া বসিয়া দুহাতে লুচি, মাংস, পোলাও, পায়স, মেঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর পালাবে, আর একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলে বলিল, 'আহা খাক্ খাক্!' দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপু সকল তোমরা রাজা হও!'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল; দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরও হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মতো বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজা মহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতোন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কি করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা তো সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি

রাজাকে এক ঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রী মহাশয় খালি দু-হাতে সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রী মহাশয় যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন! জোড় হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, 'সর্বনাশটা যে কী করলে তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দু-হাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রী মহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। দেখা গেল যে যত রাজা বসিয়া আছে কেহ সহিস, কেহ পাইক, কেহ দারোয়ান, কেহ দোকানী, কেহ ভিখারী।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখবার স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারও ইচ্ছাও নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'মন্ত্রী মহাশয় অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল হাতে, কালো ভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড় হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কী না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল! এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথায় তিনি আর কী উত্তর দিবেন! কেবল বলিলেন, আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

আর-সকলের কী হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, আমি রাজা হইয়াছি যে, কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার-যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক।'